পুনর্বাসন

সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের (ইউ.সি.আর.সি) মুখপত্র

তারিখ : ২৯.১১.২০২৫
সম্মেলন সংখ্যা

এডিটোরিয়াল বোর্ড : অর্ণব ভট্টাচার্য (সম্পাদক), সদস্যগণ : জীবনরঞ্জন ভট্টাচার্য, মধু দত্ত, রেখা গোস্বামী, চারণ চক্রবর্তী, সত্যরঞ্জন দাস, অশোক চক্রবর্তী, নরেশ দেবনাথ, দুলাল দত্ত, নারায়ণ রায় এবং দীপক ভট্টাচার্য

মূল্য : ৫ টাকা

সম্পাদকীয়

সর্বনাশা শ্রম কোড বাতিল কর

দেশের মানুষকে এস আই আর, নাগরিকত্ব, হিন্দু- মুসলিম বিভাজন ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত রেখে চুপিসারে মালিক তোষণকারী এবং চরম জন বিরোধী শ্রম কোড চালু করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। করোনা অতিমারী চলার সময় কেবল আর এস এস পরিচালিত শ্রমিক সংগঠন ছাড়া অন্য কোন শ্রমিক সংগঠনের সাথে আলোচনা ছাড়াই ২৯টি শ্রম আইনকে বিলুপ্ত করে মাত্র চারটি শ্রমকোড পার্লামেন্টে পাস করিয়ে নিয়েছিল মোদি সরকার। কার্যত বিনা বাধায় শ্রমিক শোষণ করার লাইসেন্স মালিকপক্ষকে দেওয়ার জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হয়। স্বভাবতই দেশের শ্রমিক শ্রেণী তীব্র প্রতিবাদ করে এবং লাগাতার আন্দোলন ও ধর্মঘটের মাধ্যমে সরকারকে এই আইন চালু করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। কিন্তু বিহারে নির্বাচনে জয়ের পর নিজেদের অপ্রতিরোধ্য ভেবে নিয়ে কোনোরকম আলোচনা বা প্রাক প্রস্তুতি ছাড়াই চটজলদি একতরফাভাবে চালু করে দিয়েছে চারটি শ্রমকোড। দালাল মিডিয়া যথারীতি এই শ্রমকোডের গুণগান গাইতে শুরু করে দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে মোদী ভক্তরা শ্রমিক ইউনিয়নের মুন্ডুপাত করে চলেছে। তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে শ্রমিক ইউনিয়ন গুলি। তারা এই জনবিরোধী শ্রম আইনকে রুখে দেওয়ার জন্য দেশের আপামর মেহনতী মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

শ্রম আইন সংস্কারের নামে আসলে কর্পোরেট পুঁজির অবাধ শ্রম শোষণ ও মুনাফা লুণ্ঠনে প্রবল উদ্যমে মাঠে নেমে পড়েছে মোদী সরকার। সংবিধানে শ্রম যৌথ তালিকায় থাকা সত্ত্বেও রাজ্যগুলির সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা না করে গায়ের জোরে চাপিয়ে দেওয়া হলো নতুন শ্রম আইন।

আরএসএস'র শ্রমিক সংগঠন বিএমএস ছাড়া দলমত নির্বিশেষে দেশের সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এই শ্রম কোর্ডের যে বিরোধী এবং দেশের কৃষকরাও যে এই প্রশ্নে শ্রমিকদের পক্ষে তা প্রমাণ হয়েছে তিন তিনটি সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের অভাবনীয় সাফল্যের মধ্যে দিয়ে।

স্বাধীনতার আগে থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পর দীর্ঘ এতগুলি দশক ধরে শ্রমিকশ্রেণি বহু লড়াই আন্দোলন, আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে সব সুযোগ সুবিধা ও অধিকার অর্জন করেছিল সেগুলি সুরক্ষিত ছিল ২৯টি শ্রম আইনের মাধ্যমে।দেশি-বিদেশি কর্পোরেট পুঁজির লাগামহীন মুনাফার স্বার্থে সংস্কারের নামে সেই সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো ।

এই কোডগুলিতে অনেক সুবিধার কথা বলা আছে বটে, কিন্তু সেগুলি যে কার্যত ধোঁকা তা কোডগুলি ভাল করে পড়লেই বোঝা যাবে। শ্রমকোড মালিকদের যখন খুশি শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অধিকার দিয়েছে। তাছাড়া স্থায়ী শ্রমিকের ব্যবস্থাটাই কার্যত তুলে দিয়ে ঠিকা প্রথায়, নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক কর্মী নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে। মজুরির প্রশ্নে শ্রমিকদের মতামত বা দর কষাকষির সুযোগ তুলে দেওয়া হয়েছে। মজুরি ঠিক হবে মালিকের মরজিমাফিক। কোনও নিয়ম বা বিধি শৃঙ্খলার মধ্যে তাকে বাঁধা হয়নি। শ্রমিকরা যদি বাড়তি মজুরি, সুযোগ-সুবিধা দাবি করে, তাহলে তাদের ছাঁটাই করার অধিকার মালিকের হাতে। অর্থাৎ শ্রমিকদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হচ্ছে। শ্রমিকদের শ্রম চুরি কত নিত্যনতুন উপায়ে করা যায় তার বন্দোবস্ত হয়েছে এই কোডে।

আগে ছাঁটাই/লে-অফ করতে হলে ১০০ বা তার কম শ্রমিক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে মালিকের সরকারী অনুমতি লাগতো না। এখন সেই সীমা বাড়িয়ে ৩০০ কর্মী করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দেশের ৯০% এর বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যখন তখন ছাঁটাই হয়ে যেতে পারেন।

শোষণ- বঞ্চনার প্রতিবাদে যাতে ধর্মঘট করতে বেগ পেতে হয় তাই ৬০

■ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

ইউসিআরসি-র বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন

উদ্বাস্তুদের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক অধিকার ও জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা রক্ষা করো

মধু দত্ত

এক অনিশ্চয়তা ও সংকটের মধ্যে দিয়ে চলছে আমাদের রাজ্য ও দেশ। কেন্দ্রীয় সরকার নানা ভাবে সাফল্যের কল্পকাহিনী প্রচার করলেও বাস্তবে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারী, কর্মক্ষেত্রে স্বল্প বেতন ও মজুরি, ক্রমবর্ধমান আর্থিক বৈষম্যের মত কঠোর সত্যকে আড়াল করা যাচ্ছেনা। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সংকট ও সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। তাই সারা বিশ্বজুড়েই সক্রিয় উগ্র দক্ষিণপন্থী শক্তি। এরা ধনতন্ত্রের লুটেরা চেহারাকে আড়াল করতে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় ও জাতিগত মেরুকরণকে উৎসাহিত করে ঘৃণা ও হিংসার বাতাবরণ তৈরি করছে। গরিব মেহনতী মানুষকে ধর্ম, জাতিসত্তা কিংবা গায়ের চামড়ার রঙের ভিত্তিতে আলাদা করে পারস্পরিক বৈরীতা তৈরি করা হচ্ছে। অন্যদিকে যুদ্ধ, দাঙ্গা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিশ্বে ক্রমশ বাড়ছে উদ্বাস্তু সংখ্যা।

আমাদের দেশে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার উগ্র দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক বিজেপির দ্বারা পরিচালিত। এরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসী উদারনীতির বল্গাহীন রূপায়ণ করে চলেছে যার ফলে মানুষের জীবন জীবিকা ঘোরতর সংঙ্কটে। ২০১৯ ও ২০২০ সালে আমাদের দেশে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম কোডকে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে সংখ্যাধিক্যের জোরে পাস করিয়ে নিয়েছিল। এরপর শ্রমিক শ্রেণীর লাগাতার তীব্র প্রতিবাদের জন্য সেই আইনকে তারা দীর্ঘ পাঁচ বছর চালু করতে পারেনি। বিহারে এনডিএ-র জয়ের পর উজ্জীবিত কেন্দ্রীয় সরকার ট্রেড ইউনিয়ন গুলির সাথে কোন রকম আলোচনা ছাড়াই শ্রম কোড চালু করে দিয়েছে। এরফলে যথেচ্ছ ভাবে ছাঁটাই করতে এবং শ্রমিক শোষণকে তীব্র করার আইনি স্বীকৃতি পেয়ে গেল মালিকপক্ষ। অতীতে আমরা দেখেছি কৃষি বিরোধী এবং কর্পোরেট স্বার্থবাহী কৃষি আইন রুপায়ন করতে গিয়ে সরকারকে পিছু হটতে হয়েছিল ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের চাপে। এবার সেই ভয়ঙ্কর আইনগুলিও চালু করার জন্য তৎপর হবে মোদী সরকার। এদিকে টাকার দাম কমছে, মুদ্রাস্ফীতি অব্যাহত, লাগামছাড়া পণ্য মূল্য মূল্যবৃদ্ধির গনগনে আঁচে ভুখা পেট জ্বলছে।

বিজেপির আমলে পুরো প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে এমনকি নির্বাচন কমিশনের মত স্বশাসিত সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা বলবৎ করবার চেষ্টা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বিহারে ভোটার লিস্ট সংশোধনের নামে যা হচ্ছে তা কার্যত গরিব মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে বিহারে যে সমস্ত জেলায় ভোটারদের নাম সবচেয়ে বেশি বাদ গিয়েছে সেখানে পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা ব্যাপক পরিমাণে রয়েছে। কে দেশের নাগরিক সেটা ঠিক করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের নয় অথচ সেই কাজই তারা এমন ভাবে করছে যাতে অনেক প্রকৃত নাগরিকের নাম বাদ পড়ে গিয়েছে। কার্যত পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র কে নিজেদের কব্জা করবার যে নয়া ফ্যাসিবাদী কৌশল অবলম্বন করছে নরেন্দ্র মোদি সরকার তা গোটা ভারতবর্ষের মানুষের জন্য এক অশনি সংকেত। আমাদের রাজ্যে এস আই আর এর ক্ষেত্রে আমরা এই দাবী জানিয়েছি যে মৃত এবং ভুয়ো ভোটারের নাম যেমন বাদ দিতে হবে, তেমনি একজনও প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যেন না যায়।

বিগত চৌদ্দ বছর ধরে এই রাজ্যে জনজীবন নানাভাবে বিপর্যস্ত । স্বজনপোষণ, দুর্নীতি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেটের দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ নাগরিক জীবন। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির অবস্থা সন্তোষজনক নয়। আয়ের তুলনায় ব্যয় লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশাল পরিমাণ ঋণজালে জড়িয়ে পড়েছে রাজ্য। কৃষিতে গুরুতর সঙ্কট। আমাদের রাজ্য থেকে ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে লাখো লাখো মানুষ চলে যাচ্ছেন।রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলি লুঠের আখরায় পরিণত হয়েছে। একশো দিনের কাজে পুকুর চুরি চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা না পড়ায় এইখাতে কোন টাকা আসছে না। যারা প্রকৃতই কাজ করেছেন তারাও বঞ্চিত হচ্ছেন। গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছে। সব মিলিয়ে চরম অপশাসন চলছে এই রাজ্যে।

পরিস্থিতিকে আরও সঙ্গীন করে তুলেছে নিয়োগের ক্ষেত্রে লাগামহীন দুর্নীতি। ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় চাকরি পাওয়া ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট।রাজ্যে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে।

এই সময়কালে আমাদের রাজ্যের যে ঘটনা গোটা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছে তা আর জি কর হাসপাতালের ডাক্তার তিলোত্তমার ভয়াবহ ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড। তিলোত্তমা যেন ন্যায়বিচার না পায় তার ব্যবস্থা করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্নীতি যে কি ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে তা তিলোত্তমা হত্যা ও ধর্ষণ কাণ্ডে পরিস্ফুট।

■ দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

সর্বনাশা শ্রম কোড বাতিল কর

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিনের নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ সহ নানা নিয়ম কানুন তৈরী করা হয়েছে। ইউনিয়ন তৈরী করার নিয়ম কানুন অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। এর ফলে মালিকরা সহজে শ্রমিক আন্দোলন দমন করতে পারবে।

সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজ বলা হলেও দিনে ১২ ঘন্টার শিফট বৈধ করা হয়েছে। এতে শারীরিক-মানসিক ক্লান্তি বাড়বে, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়বে। আগে ১০ জন শ্রমিক থাকলে কারখানা আইন প্রযোজ্য ছিল। এখন অনেক ক্ষেত্রেই ২০ বা ৪০ জন পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আইনগত সুরক্ষা পাবে না। PF, ESI, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, অসংগঠিত শ্রমিক- গিগ ও প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন সামাজিক সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে. কিন্তু কিভাবে পাবে, কার দায়–এ ব্যাপারে পরিষ্কার কিছু নেই। নতুন মজুরি সংজ্ঞায় PF, ESIC কাটতি বেড়ে যাবে। মাস শেষে হাতে পাওয়া টাকা কমে যাবে।

এক বছর কাজের পর গ্র্যাচুইটি দেওয়ার কথা বলে বাহবা কুড়োতে চাইছে সরকার। কিন্তু একথাটা বলা হচ্ছে না যে প্রায় সব কাজকেই চুক্তি ভিত্তিক করার সুযোগ থাকায় মালিকপক্ষের কাছে। একবছরের কম মেয়াদের চুক্তি করায় কোন বাধা নেই। সেক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। এরকম নানা ভাঁওতায় ভরা এই শ্রমকোড।

আমাদের দেশের কোটি কোটি মেহনতী মানুষের ওপর যে আঘাত নামিয়ে আনলো এই শ্রমকোড তার বিরুদ্ধে আপামর জনসাধারণকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এদেশের উদ্বাস্তু জনগণ মূলত শ্রমজীবী মানুষ। একটা ক্ষুদ্র অংশ পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত। এই শ্রমকোড চালু হয়ে গেলে সমগ্র কর্মরত উদ্বাস্তু জনগণ ও তার পরবর্তী প্রজন্ম শ্রমজীবী মানুষের অন্যান্য অংশের মতোই চরম অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হবেন। তাই গড়ে তুলতে হবে তীব্র প্রতিরোধ। বড় পুঁজিপতিদের গোলাম মোদী সরকারের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করে ছিনিয়ে নিতে হবে অধিকার।

ইউসিআরসি-র বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন

■ প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই সামগ্রিক বঞ্চনা ও ধাপ্পাবাজির অন্যতম শিকার রাজ্যের উদ্বাস্তু মানুষ। অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি তাদের মাথার উপর চেপে বসেছে অস্তিত্বের সংকট। নাগরিকত্ব নিয়ে উদ্বাস্তুদের যে সংকট বাজপেয়ী থেকে মোদী-বিজেপির সরকারগুলি তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে বামপন্থীরা এবং অবশ্যই ইউসিআরসি। এস আই আর এর সময় সি এ এ ফর্ম পূরণ করে কার্যত উদ্বাস্তুদের ফাঁদে ফেলে দিচ্ছে বিজেপি। এর বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে যেতে হবে। মতুয়া কার্ড বা হিন্দু কার্ডের নামে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য উদ্বাস্তুরা ভারতের নাগরিক। তাদের নাগরিক অধিকারকে কোনভাবেই কেড়ে নেওয়া যাবে না।

অন্যদিকে বিজেপি সরকারের প্ররোচনায় বাংলা ভাষীদের বাংলাদেশী বলে দাগিয়ে দিয়ে যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বাঙালী শ্রমজীবি মানুষকে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়েছে ইউসিআরসি তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এজেন্ডাকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে উদ্বাস্তুদের বলির পাঁঠা করছে বিজেপি।

দেশভাগের পর এই হিন্দুত্ববাদীরা উদ্বাস্তু মানুষের পুনর্বাসনে কোনো রকম ভূমিকা পালন করেনি। অথচ আজকে তারা উদ্বাস্তুদের রক্ষাকর্তা সাজার নামে কার্যত অনিশ্চয়তার গহ্বরে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। অনেক বাস্তুহারা পরিবার এখনো বিভ্রান্ত। তাদের কাছে আমাদের পৌঁছতে হবে।

রাজ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিষয়ে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়ই উদাসীন। রাজ্য সরকার নিঃশর্ত দলিল দিচ্ছেনা। রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় কলোনি উচ্ছেদ হয়েছে। ইউসিআরসির তৎপরতার জন্য কয়েকটি জায়গায় কলোনি উচ্ছেদ ঠেকিয়ে রাখা গেছে। তাই আন্দোলনের পথে অধিকার রক্ষা করতে ও জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে উদ্বাস্তুদের নিজেদের সংগঠন ইউসিআরসি-কে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

এই জটিল অথচ সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ (ইউসিআরসি)-র বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০-১১ই জানুয়ারি ২০২৬, উত্তর ২৪পরগনা জেলার ঊষুমপুর,পানিহাটীতে। প্রকাশ্য সমাবেশ হবে ১১ই জানুয়ারি ২০২৬। ইতিমধ্যে রাজ্যের সর্বত্র সমস্ত স্তরের বকেয়া সম্মেলনগুলি শেষ করার কাজ চলছে। তারই সাথে চলছে সংগঠনের ৭৫বর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার কাজ। এই রাজ্যের উদ্বাস্তু তথা সর্বস্তরের গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান ইউসিআরসি-র সম্মেলন সফল করতে আমাদের পাশে থাকুন। সাম্প্রদায়িক বিভেদ মুক্ত এবং দুর্নীতি ও অপশাসন মুক্ত দেশ ও রাজ্য গড়ে তুলতে আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হই।

বামপন্থীরা উদ্বাস্তুদের পাশে এখনও

জীবন রঞ্জন ভট্টাচার্য

কোন একটা টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিলো। একজন বিশিষ্ট বিজেপি নেতা সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি নিয়ে। সঞ্চালক ওঁকে প্রশ্ন করলেন– আচ্ছা, ওপার বাংলা থেকে যারা এপারে এল তারা তো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখেছেন, আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু তারা তো সাম্প্রদায়িক হলেন না, কারণ কি? সাক্ষাৎকারী নেতার সঠিক ও স্বাভাবিক উত্তর- বামেদের তৎপরতায়। সত্যি এটা অস্বীকার করা যায় না।

হিন্দু কৃষক ও মুসলিম কৃষক যাতে দাঙ্গায় জড়িয়ে না পরে তার জন্য '৪৬ সালের দাঙ্গার পরে পরেই প্রাদেশিক কৃষকসভা এক সভা করে তেভাগা আন্দোলনের ডাক দিল। সাফল্য ১০০%, কারণ ২৫টি জেলাতেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। দেশভাগের পর কাতারে কাতারে উদ্বাস্তু যখন শিয়ালদহ স্টেশনে এসে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়লো তখন যেসব পার্টি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল তার মধ্যে হিন্দু মহাসভাও ছিল কিন্তু উদ্বাস্তুদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের আন্দোলনে হিন্দু মহাসভা ছিল না।

অথচ উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা দেখে বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনের নেতা বসরাত হোসেন, আব্দুল হামিদ এবং সিনেমা আন্দোলনের নেতা এম.এ সঈদ প্রস্তাব দিলেন মুসলিম পরিত্যক্ত ও তালা দেওয়া বাড়িগুলিতে উদ্বাস্তুদের স্থান দিতে। তাতে কাজ হয়। উদ্বাস্তুদের মধ্যে যারা কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন তারা নৈহাটিতে ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সারা বাংলা উদ্বাস্তু সম্মেলন ডাকলেন। এই সভায় বিশিষ্ট কংগ্রেসী অমৃতলাল চ্যাটার্জি সভাপতিত্ব করেছেন। এই সভায় নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ গঠিত হলো। তাঁরা উদ্বাস্তুদের মূল দাবি রাখলেন– পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী পুনর্বাসন। এর সঙ্গে সংযোজিত হল– জওহরলাল নেহেরু দাবি না মানলে কর্মপরিষদ আন্দোলনে নামবে। চরম আপত্তি প্রকাশ করলেন অমৃতলাল চ্যাটার্জি। সম্মেলনে ঠিক হয় এ.আই.সি.সি-র জয়পুর অধিবেশনে অমৃতলাল চ্যাটার্জি, মহাদেব ভট্টাচার্য (সম্পাদক), নগেন দাস (সহ-সভাপতি) সম্মেলনে যোগ দিয়ে নেহেরুকে স্মারকলিপি দেবেন। স্মারকলিপি দিলেন নেহেরুকে, কিন্তু কোন আশ্বাস পেলেন না। ফিরে এসে কর্মপরিষদে বিষয়টি আলোচিত হয়। স্থির সিদ্ধান্ত হল আন্দোলন ছাড়া, সংগ্রাম ছাড়া দাবি আদায় করা যাবে না। সুতরাং অমৃতলাল চ্যাটার্জি পদত্যাগ করলেন। পরবর্তীকালে অমৃতলাল চ্যাটার্জি নিখিল বঙ্গ উদ্বাস্তু সংখ্যালঘু সমিতি গঠন করলেন এবং সংগঠন নামেমাত্র টিকে রইলো। কর্মপরিষদ ১৯৪৯ সালে সিদ্ধান্ত নিল জবরদখল কলোনী গড়ে তুলতে হবে। এপ্রিলে দেশবন্ধুনগর কলোনী এবং অক্টোবরে নৈহাটিতে বিজয়নগর কলোনী প্রতিষ্ঠিত হলো। এরপর দ্রুত জবরদখল কলোনী পত্তনের খবর ছড়িয়ে পড়ায় দমদম থেকে কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত জবরদখল কলোনী পত্তন হয়ে গেল। কোলকাতার দক্ষিণে জবরদখল কলোনী প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৫০ সালের জানুয়ারি থেকে যে মাসে। মূলত: আর.এস.পি ও ফরোওয়ার্ড ব্লকের নিয়ন্ত্রণে এল এই কলোনীগুলি। আর.এস.পি পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ে তোলে। কিন্তু ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চললো।

১৯৪৯ সালে যে জবরদখল আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে করে হুগলীতে ৩টি, হাওড়া ১টি, কোলকাতায় ৪টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৫৮টি এবং উত্তর ২৪ পরগনার ৮৩টি অর্থাৎ মোট ১৪৯টি জবরদখল কলোনী গড়ে ওঠে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার জবরদখল কলোনী মেনে নেবে না। তাই ১৯৫১ সালে কংগ্রেস সরকার বিধানসভায় একটি আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিল আনলো। বিলটির নাম– "অ-অনুমোদিত দখলীকৃত জমি হইতে ব্যক্তিগণের উচ্ছেদ আইন ১৯৫১"। বিলের বিরুদ্ধে ইউ.সি.আর.সি'র নেতৃত্বে ও অন্যান্য সমস্ত বামপন্থী দলের (সিপিআই-সহ) সহযোগিতায় এক ঐতিহাসিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়। উদ্বাস্তুদের ক্ষোভ ও বিক্ষোভে সন্ত্রস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত সরকার জ্যোতি বসু ও ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি মহোদয় প্রদত্ত সংশোধনী গ্রহণ করায় উচ্ছেদ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকবচ উদ্বাস্তুদের পক্ষে সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত বিলটির নাম হল– "উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও অনুমোদিত জমি হইতে অনধিকারীদের উচ্ছেদ আইন ১৯৫১"। বলা হল জীবিকার সহিত সংগতি রাখিয়া বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কাহাকেও উচ্ছেদ করা যাইবে না। ১৯৫৪ সালে ওপরে উল্লিখিত ১৪৯টি জবরদখল কলোনী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। উদ্বাস্তু দরদী যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে গঠন হল। আর ১৯৭৭ সালে এল বামফ্রন্ট সরকার। এই সময়ে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ শুরু হল। তাই শুরুতে বামপন্থীরা, আবার এখনও বামপন্থীরা উদ্বাস্তুদের পাশে থেকে কাজ করছে।

সাংগঠনিক সংবাদ

ইউসিআরসির জেলা সম্মেলন

নদিয়া জেলা : এস আই আর-এর নাম করে বেনাগরিক করার চক্রান্ত, বকেয়া দাবি পূরণ ইত্যাদি দাবিতে ও সংগঠনকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ৭ই সেপ্টেম্বর নদীয়া জেলার ১০ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো তাহেরপুর নীলাঞ্জনা ভবনে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও পুনর্বাসন পত্রিকার সম্পাদক ড. অর্ণব ভট্টাচার্য। সম্মেলনের আগে বিশাল মিছিল সংগঠিত হয়। সম্মেলনে প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সম্পাদক গৌতম বিশ্বাস। ১৮৮জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ১৯জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সিআইটিউ-র পক্ষে এসএম সাদী, কৃষকসভার পক্ষ থেকে মেঘ লাল সেখ, নাবার্ড প্রাক্তন চেয়ারম্যান শিব শংকর সাহা,অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে প্রদীপ দাস, রাজ্য সাংগঠনিক সম্পাদক দীপক ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জেলা নেতৃত্ব সুপ্রতীপ রায়, রমা বিশ্বাস। ৯৯ জনকে নিয়ে জেলা কমিটি ও ৩৯ জনকে নিয়ে সম্পাদক মন্ডলী গঠিত হয়। নবনির্বাচিত সভাপতি রতন রঞ্জন রায়, কার্যকরী সভাপতি মাধব কুমার মন্ডল, জেলা সম্পাদক গৌতম বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ সোমেশ কংস বণিক। সম্মেলন পরিচালনা করেন রতন রঞ্জন রায়, বঙ্কিম চক্রবর্তী, সুধীর শিকদারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমন্ডলী।

পূর্ব বর্ধমান জেলা : গত ৭ই সেপ্টেম্বর উদ্বাস্তুদের সর্বাঙ্গীন পুনর্বাসন এবং এস আই আরের নামে নাগরিকদের হেনস্থার বিরুদ্ধে সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ(ইউসিআরসি)'র পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলন মেমারীর পাল্লা ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হয়।সংগঠনের রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন জেলার সভাপতি সুনীলকৃষ্ণ বণিক। শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন সভাপতি সুনীলকৃষ্ণ বণিক, সংগঠনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সুমিত দে,রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সোমনাথ চক্রবর্তী ও নন্দ দুলাল গুহ,উদযাপন কমিটির সভানেত্রী অঞ্জু কর,জেলা সম্পাদক দুলাল নাগ, জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ও আঞ্চলিক কমিটির এবং ভাতৃপ্রতিম সংগঠনের সদস্যরা।মাল্যদানের পর এলাকায় মিছিল পরিক্রমা করে। সম্মেলন পরিচালনার জন্য সুনীলকৃষ্ণ বণিক, নীরদ বরন ভদ্র, কৃষ্ণা সরকার ও গৌতম সরকারকে নিয়ে সভাপতিমন্ডলী গঠন করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সুমিত দে। সম্মেলনের প্রাক্কালে ৬ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা ডঃ সুজন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী অঞ্জু কর। সম্মেলনে ১০৮ জন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ৮টি অঞ্চল থেকে ১২জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আগামী কার্যকালের জন্য সভাপতি হিসাবে সুনীল কৃষ্ণ বণিক ও সম্পাদক হিসাবে নন্দদুলাল গুহ এবং কোষাধ্যক্ষ হিসাবে অমিতাভ রায়সহ ৫৫জনের জেলা কমিটি ও ১৫ জনের সম্পাদকমন্ডলী নির্বাচিত হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা: উদ্বাস্তু অধিকারকে সুনিশ্চিত করার দাবিতে ও উদ্বাস্তু সহ সাধারণ মানুষের ঐক্য গড়ার দাবি নিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ১৩তম জেলা সম্মেলন দমদম নাগের বাজার অজিতেশ মঞ্চে। খাদ্য আন্দোলনের ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করেন সাধারণ সম্পাদক মধু দত্ত। সংগঠনের অতীত ঐতিহ্য এবং সংগঠনকে উজ্জীবিত করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সুজন চক্রবর্তী, সুমিত দে, গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব পলাশ দাশ। উপস্থিত ছিলেন ঝন্টু মজুমদার, হারাধন ব্যানার্জি, দীপক ভট্টাচার্য। সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন চারণ চক্রবর্তী, আয়-ব্যায় হিসাব পেশ করেন সত্য রঞ্জন দাস। ২৫০জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৩৬ জনের আলোচনায় সমৃদ্ধ প্রতিবেদন গৃহীত হয়। ১৪০ জনকে নিয়ে জেলা কমিটি গঠিত হয়। অনুপ মিত্র সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি গোপাল সরকার, সম্পাদক চারণ চক্রবর্তী নির্বাচিত হন। সম্মেলন শেষে মিছিল সংগঠিত হয়ে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সুমিত দে, চারণ চক্রবর্তী, বিমল সিংহ। গণসংগীত পরিবেশন করেন গণনাট্যের দমদম সাংস্কৃতিক শাখা।

উদ্বাস্তু আন্দোলনে বর্ধমান জেলার ইতিহাস

নন্দ দুলাল গুহ

অতীতে রক্তঝরা উদ্বাস্তু আন্দোলনের পীঠস্থান ছিলো গোপালপুর, পানাগড় এয়ারফিল্ড অ্যাকোমোডেশন ক্যাম্প, মেমারীর পাল্লা ও মহেশডাঙ্গা ক্যাম্প। উদ্বাস্তু আন্দোলনে বর্ধমান জেলা গৌরবোজ্বল ভূমিকা পালন করলেও তার ইতিহাস সেইভাবে লিপিবদ্ধ না থাকায় বিভিন্ন তথ্য এবং তুষার সিংহ ও বর্তমানে মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পের নীরদবরন ভদ্রর লেখা থেকে যতটুকু জানা যায় তা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট কলোনীর সংখ্যা ১৫৮ টি। তার মধ্যে জি এস কলোনী ১৫ টি,৬০৭ গ্রুপের কলোনী ৫০ টি,৯৯৮ গ্রুপের কলোনী ২৪ টি,প্রাইভেট কলোনী ৩৮ টি এবং বিশেষ গ্রুপ ভুক্ত কলোনীর সংখ্যা ৩৮ টি। জেলায় ১৪৯ ও ১৭৫ গ্রুপের কোনো কলোনী নাই ।

দেশ বিভাগের বলি হয়ে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমুল মানুষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে কলকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশন,মেটিয়াব্রুজ,পরিত্যক্ত সেনা ছাউনি সহ অন্যান্য জায়গায় অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিন যাপন করতেন। সেখানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দেওয়া রুটি,চিড়ে,গুড় ও মুড়ি খেয়ে দিন যাপন করতেন। পরবর্তীকালে তাদের কলকাতা থেকে দুরে বর্ধমান জেলাতে ১৪/১৫ টি উদ্বাস্তু ক্যাম্পের মধ্যে পাল্লা ও মহেশডাঙ্গা এবং গুসকড়ার নবাব নগরে Work Site Camp এ রাখা হয়েছিলো। ২০/২৫ টি পরিবার প্রতি পানীয় জলের জন্য একটি করে Tube well ছিলো। সরকার থেকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর উদ্বাস্তুদের Cash dole দেওয়া হোতো। ৮ বছরের বেশী বয়সীদের ১৫ দিন অন্তর ৬ টাকা, তার নীচের বয়সীদের জন্য ৪ টাকা করে দেওয়া হোতো। কিন্তু একই পরিবারে ৩০ টাকার বেশী দেওয়া হোতোনা। কিছুদিন পর সরকারের থেকে নির্দেশিকা জারী হোলো ক্যাম্পে বসবাসকারী প্রাপ্ত বয়স্কদের মাটি কাটার কাজ করতে হবে। তারা Cash dole পাবে না। কাজের বিনিময়ে ৬ আনা মজুরী পাবে। এই শর্তে পাল্লা ক্যাম্পে কিছুদিন মাটি কাটার কাজ করানো হয়েছিলো। কিন্ত মহেশডাঙা ক্যাম্পে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। মহেশডাঙা ক্যাম্পের কেউই মাটি কাটার কাজ করেন নি। পরে পাল্লা ক্যাম্পেও মাটি কাটার কাজ বন্ধ করা হয়।

দেশভাগের কারনে পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন দিলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য ভারত সরকার কোনো ব্যবস্থাই করেন নাই। কলকাতা কেন্দ্রীক জবর দখল কলোনী সহ বাগজোলা ক্যাম্প,কুপার্স ক্যাম্প ও ঘুসুড়িয়া প্রভৃতি ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের উপর রাজ্য সরকারের পুলিশ, স্থানীয় জমিদারের লেঠেল বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং বাংলার উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের দাবীতে ইউ সি আর সি সংগঠনের ডাকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। কলকাতা ছাড়িয়ে আমাদের জেলাতেও তার প্রভাব পড়ে এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে আন্দোলন সংগঠিত হয়। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য পাল্লা ও মহেশডাঙ্গা এবং গোপালপুর, পানাগড় এয়ারফিল্ড অ্যাকোমোডেশন ক্যাম্প। ইউ সি আর সি জেলা সংগঠনের পক্ষ থেকে ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের যথাযথ কাজ ও মজুরীর দাবীতে ১৯৫৭ সালের ২২ শে এপ্রিল জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্বে ছিলেন জেলা সভাপতি বিনয় চৌধুরী,জেলা সম্পাদক প্রদীপ ঘোষ এবং প্রানকৃষ্ণ চক্রবর্তী,হরেকৃষ্ণ কোঙ্গার, সুবিমল ঘোষ(এম পি),শুভময় শূর(উদ্বাস্তু অধিকার রক্ষা সমিতির জেলা সম্পাদক)।

১৯৫৯ সালের প্রথমদিকে পাল্লা ও মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা যোগেশ চন্দ্র মন্ডলের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে পাল্লা,মহেশডাঙ্গা সহ অন্যান্য জায়গা থেকে ১০৫ কিলোমিটার রাস্তা তিনদিন ধরে পায়ে হেঁটে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়। শুরু হয় রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান। রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের সময় রাজ্য সরকারের পুলিশ আন্দোলনকারী উদ্বাস্তুদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটায়। তাতে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অনেকেই আহত হন। রাজ্যপুলিশ আন্দোলনকারীদের জোরপূর্বক প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়ে কলকাতার “ধাপার বিল” এ ফেলে দিয়ে আসতো। সেখান থেকে আন্দোলনকারীরা আবার পায়ে হেঁটে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার ও রানী রাসমনি রোডে জড়ো হয়ে আবার রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে অংশ গ্রহন করতো। একদিন-দুদিন নয় প্রায় মাসাধিক কাল আন্দোলন চালিয়েও সরকারের কাছে কোনো সুবিচার পাওয়া যায়নি।

উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠ পুনর্বাসন সহ অন্যান্য দাবীতে ইউ সি আর সি সংগঠনের ডাকে আমরন অনশন কর্সুচিতে পাল্লা,মহেশডাঙ্গা ও গোপালপুর সহ অন্যান্য জায়গায় অনশন আন্দোলন কর্মসুচি পালিত হয়। কালিপদ বিশ্বাসের নেতৃত্বে অনশন শুরু হয়। মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পে ২২ দিন অনশন করার পর সাবিত্রী তরুয়া(পাগলী মা) ও কৃষ্ণধন বিশ্বাস খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। যোগেশ চন্দ্র মন্ডলের অনুরোধে সকলে আলোচনা করে কৃষ্ণধন বিশ্বাস ও পাগলী মা’কে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কৃষ্ণধন বিশ্বাস ও পাগলী মা’কে হাসপাতালে পাঠানোর দিনই ৩ নং মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পের মতিলাল বসু মহাশয়ের ৭০ বছরের বৃদ্ধা মা অনশনে বসেন। তার ৭/৮ দিন পর অনশন প্রত্যাহার হয়। পাল্লা ক্যাম্প সহ অন্যান্য আরও উদ্বাস্তু কলোনীতেও আমরন অনশন কর্মসুচি পালিত হয়েছিলো। কিন্তু অংশগ্রহন কারীদের নামের তালিকা না থাকায় তা সংযোজিত করা গেলোনা।

গোপালপুর ও পানাগড় এয়ারফিল্ডেও উদ্বাস্তুরা আমরন অনশন করেছেন এবং বর্ধমান, আসানসোল ও পুরুলিয়া জেলে জেল জীবন যাপন করেছেন তারা হলেন ১) গোপাল চন্দ্র অধিকারী ২) সূর্য কান্ত বিশ্বাস ৩) লাবন্য বালা দাস ৪) শ্রী মতি গায়েন ৫) সরোজিনী বিশ্বাস ৬) সুখদা রানী দাম ৭) অঞ্জলি ধর ৮) দূর্গা দত্ত ৯) রাধারানী অধিকারী ১০) সত্যেন্দ্র নাথ সমাদ্দার ১১) হীরন বালা দাস ১২) কৃষ্ণকান্ত ব্যাপারী ১৩) শ্রী মতি মন্ডল (কাঁকসা) ১৪) জীতেন মন্ডল ১৫) অর্জুন সরকার (বসুধা) ১৬) জীতেন হালদার ১৭) শচীন দেবনাথ ১৮) তারক শিকদার।

অনশনরত নেতৃত্বের উপর পুলিশের আক্রমণের বিরুদ্ধে ১৯৫৯ সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর গোপালপুর ট্রানজিট ক্যাম্পে প্রতিবাদ সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। প্রধান বক্তা ছিলেন জ্যোতি বসু, সমর মুখার্জী, প্রানকৃষ্ণ চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সুধাংশু রায়, জীতেন দে, মহাদেব মুখার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অনশন আন্দোলন চলাকালীন গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা পালা করে রাতদিন অনশন শিবির ও সারা ক্যাম্প পাহাড়া দিতেন,যাতে পুলিশ এসে অনশন কারীদের তুলে নিয়ে যেতে না পারে। পুলিশের গাড়ী আসলে ছোটো ছেলেরা বাঁশি বাজিয়ে জানিয়ে দিতো পুলিশের গাড়ি আসছে। পুলিশ আসার সংকেত পেলে তাদের বাধা দেওয়ার জন্য সারা ক্যাম্পের মহিলারা অনশন শিবিরে এসে জড়ো হতেন এবং মহিলা ও শিশুরা রাস্তায় শুয়ে পড়ে পুলিশকে বাধা দিতেন। পুলিশ কাঁদনে গ্যাস ও গুলি চালাতে পারে সেইমত মানসিক জোর ও প্রস্তুতি নিয়ে সকল মহিলারা অনশন শিবিরে আসতেন। কারন বাগজোলা ক্যাম্পে অনশন শিবিরে পুলিশ গুলি চালিয়েছে এবং তাতে অনেকেই হতাহত হয়েছেন এই সংবাদ আমাদের জেলাতেও এসে পৌঁছেছিলো। এতে ভয় না পেয়ে উদ্বাস্তুরা আরও সংঘবদ্ধ হয়েছে লড়াই করার জন্য। দেশ ভাগের সময় থেকেই উদ্বাস্তুদের পাশে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি সবসময় থেকেছেন। আমাদের জেলাতেও কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব বিনয়কৃষ্ণ কোঙ্গার সহ মেমারীর দেবী গাঙ্গুলি,কেন্না গ্রামের শিবানী চট্টোপাধ্যায়,দেওলিয়া গ্রামের সাত্তার সাহেব,জামালপুর গফফর সাহেব সহ অন্যান্যরা সবসময় উদ্বাস্তুমানুষের আন্দোলনের পাশে থেকেছেন। মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পের সুধন্য সরকার,নিত্যানন্দ তরুয়া,সন্তোষ হালদার, মতিলাল বিশ্বাস ও অন্যান্যরা ইউ সি আর সি সংগঠন গড়ে তোলেন। পাল্লা বাজার এবং গুসকড়ার ছোড়াতে ইউ সি আর সি সংগঠনের নিজস্ব অফিস ঘর আছে।

উদ্বস্তু সংগঠন গড়ে তোলার জন্য রাজ্য নেতৃত্ব শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত শূর, অম্বিকা চক্রবর্তী এবং প্রানকৃষ্ণ চক্রবর্তী একাধিকবার মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পে এসেছেন। উদ্বাস্তু আন্দোলনে প্রানকৃষ্ণ চক্রবর্তীর অবদানকে স্মরনে রেখে বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে মহেশডাঙ্গা ক্যাম্পে ডি ভি সি ক্যানেলের উপর নির্মিত সেতুর নাম করন করা হয়েছে “প্রানকৃষ্ণ সেতু”।

সংগঠনের ৫০ তম বর্ষে ২০০০ সালের ২৯ ও ৩০ শে এপ্রিল গোপালপুর কলোনীর কাঁকসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন গন আন্দোলনের নেত্রী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্র মন্ত্রী অঞ্জু কর। ২৯ শে এপ্রিল গোপালপুর উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের শুরুতে সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র হালদার উপরোক্ত ১৮ জন বীর যোদ্ধাদের সম্বর্ধিত করেন। প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণ-আন্দোলনের নেতা নিরুপম সেন।

সংগঠনের ৭৫ তম বর্ষে ২০২৫ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলাতে গণ-আন্দোলনের নেত্রী অঞ্জু করে সভাপতিত্বে উদযাপন কমিটি গঠিত হয়। উদযাপনের অংশ হিসাবে “উদ্বাস্তু আন্দোলনের অতীত ঐতিহ্য এবং আমাদের কর্তব্য” সহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির এবং বৃক্ষ রোপণের মতন সামাজিক কর্মসূচি পালিত হয়। ২০২৫ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর মেমারীর পাল্লা ক্যাম্পে কেদার দাম ও জগবন্ধু দাঁ নগরে এবং জনার্দন সরকার ও অমল চক্রবর্তী মঞ্চে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের পূর্বে ৬ই সেপ্টেম্বর পাল্লা বাজারে কয়েক সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের শুরুতে উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রাক্তন নেতৃত্বদের সম্বর্ধিত করা হয়। প্রকাশ্য সমাবেশে মুখ্য বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সংগঠনের উপদেষ্টা সুজন চক্রবর্তী। জেলা উদযাপন কমিটির সভানেত্রী অঞ্জু কর ও জেলা সম্পাদক দুলাল নাগও বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন নন্দ দুলাল গুহ ও শ্যামল বিশ্বাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি সুনীলকৃষ্ণ বণিক।

ইউ সি আর সি-র সম্মেলন সমূহ

১ম সম্মেলন	১৯৫০ সালের ১২-১৩ আগস্ট, স্থান: ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল।
২য় সম্মেলন	১৯৫৪ সালের ২০-২১ আগস্ট, স্থানঃ নেতাজিনগর, টালিগঞ্জ।
৩য় সম্মেলন	১৯৫৫ সালের ২৭-২৯ আগস্ট, স্থানঃ দেশপ্রিয় কলোনি, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা।
৪র্থ সম্মেলন	১৯৫৭ সালের ৭-৯ ডিসেম্বর, স্থানঃ কুপার্স ক্যাম্প, রাণাঘাট, নদীয়া।
৫ম সম্মেলন	১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে, স্থান: এবিটিএ হল, কলকাতা।
৬ষ্ঠ সম্মেলন	১৯৬১ সালের ৯-১১ জুন, স্থান: তীর্থভারতী, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগণা।
৭ম সম্মেলন	১৯৬২ সালের ১-২ সেপ্টেম্বর, স্থানঃ নেতাজী নগর, টালিগঞ্জ, কলকাতা।
৮ম সম্মেলন	১৯৬৬ সালের ২০-২১ আগস্ট, স্থানঃ নেতাজী নগর, টালিগঞ্জ, কলকাতা।
৯ম সম্মেলন	১৯৬৭ সালের ১৭-১৯ নভেম্বর, স্থান: বাণীপীঠ হাইস্কুল, অশোকনগর, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।
১০ম সম্মেলন	১৯৬৯ সালের ২৯-৩১ শে আগস্ট, স্থান: বাণীমন্দির, ঘুঘুডাঙা, দমদম, উত্তর ২৪ পরগণা।
১১তম সম্মেলন	১৯৭১ সালের ১০-১২ সেপ্টেম্বর, স্থানঃ শিবানী সিনেমা হল, ফুলবাগান।
১২তম সম্মেলন	১৯৭৭ সালের ২৭-২৮ আগস্ট, স্থান: বিজয়গড়, যাদবপুর।
১৩তম সম্মেলন	১৯৭৯ সালের ১২-১৩ মে, স্থানঃ কোতরং, হুগলি।
১৪তম সম্মেলন	১৯৯৩ সালের ১৪-১৫ আগস্ট, স্থান: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, সল্টলেক।
১৫তম সম্মেলন	১৯৯৭ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর, স্থানঃ বর্ধমান।
১৬তম সম্মেলন	২০০০ সালের ১১-১৩ আগস্ট, স্থানঃ হালিশহর লোকসংস্কৃতি ভবন, উত্তর ২৪ পরগণা।
১৭তম সম্মেলন	২০০৭ সালের ১২-১৩ মার্চ, স্থান: জগৎপুর, বাগুইহাটি, রাজারহাট, উত্তর ২৪ পরগণা।
১৮তম সম্মেলন	২০১৭ সালের ১০-১২ জুন, স্থানঃ সুকান্ত মঞ্চ, কোচবিহার শহর।
১৯তম সম্মেলন	২০২২ সালের ২৫-২৬ জুন, স্থানঃ সংগ্রাম সমিতি হল। রামরাজাতলা, হাওড়া।
২০ তম সম্মেলন	(অনুষ্ঠিত হবে) ১০-১১ জানুয়ারি, ২০২৬, স্থান: পানিহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা

এস আই আর

আতঙ্ক কাটাতে হবে, মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে

সুজন চক্রবর্তী

এসআইআর আতঙ্কে চিঁড়েচ্যাপ্টা রাজ্যের মানুষ। সন্দেহজনক ডি ভোটার, ডিটেনশন ক্যাম্প, এনআরসি তালিকা- এসবের নামে গত কয়েক বছর ধরে আসামে বিজেপি'র শাসক বাহিনী যে দাপাদাপি চালিয়ে যাচ্ছে তাতে মানুষের আতঙ্ক স্বাভাবিক। মুসলিম বিতাড়নের নাম করে এনআরসি ২০১৯ সালে আসামে যে তালিকা তৈরি করল, তাতে শেষমেশ ১৯ লক্ষ লোকের নাম বাদ। তার মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ বাঙালি হিন্দু এবং অবশ্যই গরিব মানুষ। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে গরিব মানুষের জীবন-জীবিকা-অস্তিত্ব-পরিচিতির উপরেই আক্রমণ। কিন্তু অবস্থা এমনই জটিল যে ২০১৯ থেকে ৬ বছর পার হয়ে গেলেও সরকার এখনও আসামের চূড়ান্ত তালিকা ঘোষণা করতে পারল না। শুধু ভয় এবং আতঙ্কে থানা-পুলিশ-আদালতের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই বুঝি ডিটেনশন ক্যাম্প, বুঝি বা অ-নাগরিক কিংবা দেশের সীমানার বাইরে ঠেলে দিয়ে দেশহীন মানুষে পরিণত হতে হয়! ভয়ঙ্কর সে সব পরিণতি অকল্পনীয়।

এ রাজ্যের সর্বনাশা ব্যবস্থা এমনই যে, অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী বহু প্রান্তিক মানুষ নানান হেনস্তার শিকার। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড, প্যান কার্ড, প্রতিবেশীদের চেনা জানা- এসব কোনও কিছুই নাকি মানুষের ভোটাধিকারের পরিচয় বহন করে না। নিষ্ঠুর আতঙ্কের শিকার হতে হচ্ছে গরিব, পরিযায়ী শ্রমিক, আদিবাসী, দলিত, বাস্তুহারা, মতুয়া, সংখ্যালঘু এই সমস্ত প্রান্তিক মানুষদের। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবাংলায় এসআইআর বহু সাধারণ মানুষকে অস্থিরতা-অস্বস্তি-অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্কের পরিবেশে ঠেলে দিয়েছে।

এরই পাশাপাশি মানুষ খেয়াল করছেন কিভাবে বিহরে এসআইআর'র নামে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম, ভোটার তালিকায় বাদ দেওয়া হয়েছে। বিজেপি নেতারা একটানা বলে গেলেন- রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি মুসলমানদের তাড়াবার জন্যই নাকি বিহারে এসআইআর। প্রধানমন্ত্রী একটার পর একটা সভায় সভায় ঘুসপেটিয়া-অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে গেলেন। কিন্তু বাতিল তালিকায় তাদের কতজনকে পাওয়া গেল? তাহলে কারা বাদ গেলেন? সংখ্যাগরিষ্ঠ মহিলা, সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিযায়ী শ্রমিক- যাদের বাড়িতে গিয়ে নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি। গরিব প্রান্তিক মানুষ, যাঁদের কাছে কাগজ কম, তাঁরাই শিকার হলেন বিহারের তালিকায়। মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, হরিয়ানায় ভোটার তালিকায় নানান রকমের যোগ-বিয়োগের অনৈতিক খেলায় শাসক বিজেপি-কে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কি ভয়ঙ্কর অপচেষ্টা হয়েছে, তা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

এই প্রেক্ষিতেই পশ্চিমবাংলায় এসআইআর। হেনস্তা এবং আতঙ্কের পরিবেশ তাই অস্বাভাবিক নয়। এই ভয় প্রাথমিকভাবে তৈরি করেছে নির্বাচন কমিশন নিজেই। সমানতালে বিএলও-দের চাপ সৃষ্টি করেছে বিজেপি এবং তৃণমূল। ওদিকে নির্বাচন কমিশনও চূড়ান্তভাবে অপ্রস্তুত। বিএলও-দের অফিস কাছারির কাজ ফেলে ভোটার তালিকার কাজে আতঙ্কের মধ্যে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে। সময়ে বাঁধা কাজ, তার উপর নিত্য নতুন নির্দেশ আর ফরমান জারি হচ্ছে। তার উপর অসম্ভব চাপের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তাদের নিরাপত্তার বিষয়ে কমিশনের কোনও দায় নেই যেন

নির্ভুল ভোটার তালিকা চায় মানুষ। এটাই স্বাভাবি মৃত-ভূতুড়ে নামে ভর্তি ভোটার তালিকা। তা বাদ দিতেহবে। যোগ্যদের নাম রক্ষা করতে হবে। নতুন ভোটারদের নাম সংযোজন করতে হবে। এসবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বারে বারে দাবি করা সত্ত্বেও গত কয়েক বছর ধরে তালিকা পরিষ্কার করা হয়নি। ভূতুড়ে ভোটারের সুবিধা পেতে চেয়েছে রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। সেইমত করেই বাতিল যোগ্য ভুতুড়ে অথবা মৃত মানুষের নাম বছর পর বছর রক্ষা করে চলেছে নির্বাচন কমিশন।

মানুষের দাবি নির্ভুল ভোটার তালিকা। তার জন্য এসআইআর লাগবে কেন? বাপ ঠাকুরদা'র নাম খুঁজতে হবে কেন? ২০০২ এর ভোটার তালিকা ভিত্তি হবে কেন? পি মশা মারতে কামান দাগাতে হবে কেন? ২০১৯, ২০২১ বা ২০২৪-এর সর্বশেষ নির্বাচনের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে নির্ভুল প্রচেষ্টা নয় কেন? ব্যাঙ্ক, প্যান, গ্যাস সব লিঙ্কের জন্য আধার কার্ড। কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও এক্ষেত্রে আধার কার্ডকে মান্যতা নয় কেন? ভোটার তালিকা নির্ভুল করার জন্য তো

কামান দাগার দরকার হয় না।

এসআইআর'র নতুন নিয়ম যেন মনে হচ্ছে, ভোটারদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা। আতঙ্ক আর অনিশ্চয়তায় হয়রান হচ্ছেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। নাগরিকত্বের তালিকা অথবা সরকারের কোনও হিডেন অ্যাজেন্ডাকে কার্যকরী করা নির্বাচন কমিশনের কাজ নয়- এটা স্পষ্ট থাকা দরকার। ওগুলো সরকারের কাজ, নির্বাচন কমিশনের নয়। এধরনের কোনও কাজ ঘাড়ে নিয়ে কমিশন বিএলও-দের বা ভোটারদের বিপর্যস্ত করতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে, রাজ্যে তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে তালিকায় ভোটার সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বরাবরই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে ভোটার বৃদ্ধি তুলনীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ থেকেছে। খুব বেশি হলে ২-৩ শতাংশের ফারাক। তৃণমূল আমলে এই ফারাকটা ক্রমশই বেড়েছে। ২০১৪ সালে এই ফারাক প্রায় ৮০ লক্ষ, যা শতাংশের বিচারে ১৩ শতাংশ।

এরপর কেন্দ্রে বিজেপি'র সরকার। কেন্দ্রে বিজেপি রাজ্যে তৃণমূল- যেন 'ডবল ইঞ্জিন সরকার'। জনসংখ্যার সাথে ভোটার বৃদ্ধির ফারাকটাও দ্বিগুণ হয়ে গেল। ২০২৪ সালে সংখ্যার বিচারে এই ফারাক বেড়ে হলো প্রায় দেড় কোটি। শতাংশের বিচারে ২০ শতাংশের বেশি। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা ফারাক কেন, তা নিয়ে যে যতই গবেষণা করুক, এর দায় তৃণমূল এবং বিজেপি অস্বীকার করতে পারে না। নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরিতে স্বাভাবিকভাবেই এদের আগ্রহ থাকার কথা না। ভোটার তালিকাকে কলুষিত করতেই এদের আগ্রহ। তৃণমূল মৃত-ভূতুড়ে নাম রক্ষা করতে আগ্রহী। আবার বিজেপি যোগ্য মানুষের নাম বাদ দিতেই আগ্রহী। মানুষের দাবি স্পষ্ট। মৃত-ভুতুড়ে নাম বাদ দিতে হবে। যোগ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। নতুন ভোটারের নাম সংযোজন করতে হবে।

সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যের ভোটার তালিকায় বুথ পিছু গড়পড়তা মৃত-ভূতুড়ে কিংবা ডবল এন্ট্রি মানুষের সংখ্যা কমবেশি সাত-আট-দশ শতাংশ। এমনকি তাঁর চাইতেও বেশি হতে পারে। কিন্তু সন্দেহ নেই যে এর বাইরেও কিছু ভোটার আছে যাঁরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত। দেশভাগের শিকার। প্রয়োজনবোধে তারা এদেশে ফিরে আসতে পারেন এবং তাঁদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ভারত রাষ্ট্রের- এই স্বীকারোক্তি গান্ধী-নেহরু সহ তৎকালীন দেশনেতাদের সবারই। এটা নিয়েও সন্দেহ নেই যে সহায় সম্বল সম্পন্ন একটা বড় অংশের মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে স্বাধীনতার পর এ দেশে চলে আসলেও, সহায়-সম্বলহীন, দারিদ্র পীড়িত, পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষ, মতুয়া সমাজের একটা বড় অংশ সাম্প্রতিক সময়ে এ দেশে চলে এসেছেন। দেশের আইনের তাঁর স্বীকৃতিও আছে। এই মানুষগুলিকেই এসআইআর'র নাম করে বিপর্যস্ত করা হচ্ছে।

বাস্তবত, ২০০৩ সালের নাগরিকত্ব সংশোধন আইন এই সমস্ত মানুষের জন্য সবচাইতে বিপজ্জনক এবং সর্বনাশা। তখন কেন্দ্রে এনডিএ সরকার, প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। তারই মন্ত্রীসভার সদস্য মমতা ব্যানার্জি। বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বলে দাগিয়ে দেওয়া হলো এদের উদ্বাস্তু এবং গরিব মানুষদের, যাদের কাগজের শক্তি স্বভাবতই দুর্বল। ২০১৯ সালে জবরদস্তি জারি করা হলো সিএএ আইন। কিন্তু আসামেই হোক বা পশ্চিমবঙ্গেই হোক- এই মানুষেরা কি নাগরিকত্ব পেলেন? বরং এক্ষেত্রে নাগরিকত্বের দরখাস্ত আরও বিপর্যয় তৈরি করতে পারে। গরিব, উদ্বাস্তু, মতুয়া, আদিবাসী মানুষ ক্রমশই তা বুঝতে পারছেন। রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মানুষের নিঃশর্ত নাগরিকত্বই যে একমাত্র সমাধান- মানুষ তা ক্রমশই বুঝতে পারছেন।

সম্প্রতি, ২০২৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিধি প্রণয়ন করে এদেশে এদের থাকার অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। এমনকি ২০২৪-এর ৩১ ডিসেম্বরের আগে যারা এদেশে এসেছেন, তাদের একটা অংশকে এই স্বীকৃতি। তাহলে ২০০২-এর ভোটার তালিকাকে ভিত্তি করে প্রান্তিক-উদ্বাস্তু-খালপাড়ে থাকা-মতুয়া মানুষদের ভয় দেখানোর জন্য এসআইআর'র এই ব্যবস্থাপনা কেন- স্বাভাবিকভাবেই সে প্রশ্ন আসবে। এই মানুষদের একটা বড় অংশই ২০২৪, ২০২১ এবং ২০১৯-এর নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। এদের ভোটেই তৃণমূল এবং বিজেপি'র এমএলএ, এমপি-রা জিতে সরকার গড়েছেন। এই ভোটাররা যদি বাতিলযোগ্য হয়, তবে এদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যোগ্য থাকেন কি করে? তাঁরাও তো বাতিলযোগ্য হতে বাধ্য। এই গরিব মানুষগুলোকে দাবার বোড়ে করে বিজেপি-তৃণমূলের রাজনীতির পাশা খেলা মেনে। নেওয়া যায় না।

ভোটাধিকারের ভিত্তি হয়, তা কখনো সঙ্গত হতে পারে না।' ২০০২-এর আগে যারা এদেশে চলে এসেছেন তারা শুদ্ধ, আর পরে হলেই অশুদ্ধ- এটা কোনও বিবেচনা? ২০০২--এর আগে এদেশে যারা এসেছেন তারা নাগরিক, আর পরে আসলে তারা নাগরিক নয়- এটা কোন আইনের অংশ? এর মধ্যে বরং শাসক বিজেপি'র শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় পাওয়া যায়। পিছিয়ে থাকা দারিদ্র পীড়িত মতুয়া অংশের মানুষই সাধারণভাবে পরে এসেছেন। অতএব তারা ব্রাত্য। বিজেপি-বা আরএসএস'র কাছে ঘোষিত শত্রু মুসলমান সমাজ হলেও অঘোষিত শত্রু শূদ্র, দলিত, পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষ। নির্বাচন কমিশন এই রাজনীতির কলুষতার অংশীদার হয়ে দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের যে বিপদ ডেকে আনছে- তা চলতে পারে না।

ভোটার তালিকায় এসআইআর'র সুযোগে বাংলাদেশি মুসলমান অথবা রোহিঙ্গা বিতাড়নের আওয়াজ তুলে। বিজেপি আসলে মনুবাদের নির্দেশই পালন করতে চায়। মুসলমান বা হিন্দু নয়, বিপন্ন আসলে গরিব মানুষ। পিছিয়ে পড়া, দলিত, মতুয়া, উদ্বাস্তু, আদিবাসী, খালপাড়ে থাকা অসংখ্য মানুষ। ২০০২-এর তালিকা অথবা বংশলতিকা, এই রক্তের সম্পর্ক- এসবকে ভিত্তি করে ভোটার তালিকার নামে নির্বাচন কমিশন কি আসলে আরএসএস-বিজেপি'র। হিডেন অ্যা জেন্ডাকেই পূরণ করতে চায়? তা মেনে নেওয়া-যায় না।

আপাতত এনিউমারেশন ফর্ম পূরণ। খসড়া তালিকা প্রকাশ হলে ডিসেম্বর জুড়ে আবারও ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার মৃত, ভূতুড়ে নাম বাদ গেল কি না। নচেৎ ৭ নং ফর্মে সংবর্জনের দরখাস্ত করতে হবে। স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কোনও মানুষ, সাম্প্রতিক সময়েও ভোট এই দিয়েছেন, যাকে খুশি তাকেই দিয়েছেন- এমন কোন কোন নাম বাদ গেল? ৬ নং ফর্মে তাদের সংযোজনের দরখাস্ত করতে হবে অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনের দরখাস্ত। ন ডিসেম্বর মাস জুড়েই সজাগ থাকতে হবে। তারপর হিয়ারিং। কোনও যোগ্য সহ নাগরিক যেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এই বঞ্চনার জ্বালা কি-। আসামের ডি ভোটাররা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

ভোটের তালিকায় কেবল একটি যথার্থ নামের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নই নয়। ভোটাধিকার। গণতন্ত্র। মানবিক-নাগরিক অধিকার। সহ নাগরিকদের সাথে একসাথে অধিকারবোধ। মানুষের নিজের অস্তিত্ব এবং পূর্ণতার একটি প্রতিচ্ছবি। ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক। সেই মনোভাবে বুথের কর্মী যখন পাড়ার ছেলে হয়ে ওঠেন তখনই তা জনমানসে ভরসার শক্তি গড়ে তুলতে পারে। এখন সময় তারই অনুশীলনের।

৫৫, সূর্য সেন স্ট্রিট ১০৪নং রুম, কৃষ্ণপদ ট্রাস্ট বিল্ডিং কলকাতা-৭০০০০৯, পুনর্বাসন-এর পক্ষে ঝন্টু দে কর্তৃক প্রকাশিত এবং
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, কলকাতা-১৬ থেকে মুদ্রিত।